

মহানবী

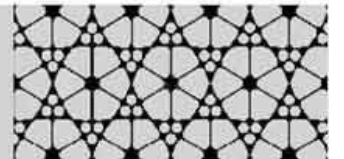
সাদ্দাদ্দাছ আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম

মাজিদা রিফা

দাওরায়ে হাদীস : মাদরাসাতুল বানাত, উপশহর, সিলেট



রাহবার



ਅੰ

যমযম কূপ	
১. ইতিহাসের ইতিহাস.....	১১
যমযম কূপ সৃষ্টি.....	১২
২. জীবন-মৃত্যুর খেলাঘরে.....	১৭
আবদুল্লাহকে কুরবানি.....	২০
আবদুল্লাহর মৃত্যু.....	২২
হস্তিবাহিনীর ঘটনা	
৩. পৃথিবী জুড়ে অন্ধকার.....	২৩
আবরাহার দম্ভ.....	২৩
আরব জাতির ইতিহাস.....	২৬
নবীজির শৈশব-কৈশোর	
৪. আমেনার আলোশিশু.....	৩৪
৫. সৌভাগ্যের পরশমণি.....	৩৮
হালীমার ঘরে.....	৩৮
৬. ভালোবাসার ছায়া.....	৪১
আমেনার মৃত্যু.....	৪২
সিরিয়ার পাদরির ভবিষ্যদ্বাণী.....	৪৪
হিলফুল ফুয়ুল গঠন.....	৪৬
বিবাহ	
৭. চন্দ্রমানবীর রাজপুষ্প.....	৪৭
নবুওয়ত প্রাপ্তি	
৮. পবিত্র কিতাব.....	৫১
আরবদের অধঃপতনের চিত্র.....	৫৩
অহী নাযিল.....	৫৮
৯. জান্নাতের আহ্বান.....	৬১
আবু বকর রা. এর ইসলাম গ্রহণ.....	৬১
ইসলাম প্রচার	
১০. মানুষরূপী শয়তান.....	৬৬
প্রকাশ্যে দাওয়াত.....	৬৬
১১. বাধার পাহাড়, স্নেহের ছায়া.....	৭২
কাফেরদের অত্যাচার	
১২. আঁধারবন্দী.....	৭৯
বেলাল রা. এর উপর অত্যাচার.....	৭৯
ইসলামের প্রথম শহীদ নারী.....	৮২
১৩. অন্যভবন.....	৮৩

উসমান রা. এর ইসলাম গ্রহণ.....	৮৪
হাবাশায় হিজরত.....	৮৭
নাজাশীর দরবারে.....	৮৮
১৪. ঘৃণা ও ভালোবাসা.....	৯২
হামযা রা. এর ইসলাম গ্রহণ.....	৯২
উমর রা. এর ইসলাম গ্রহণ.....	৯৩
শিআবে আবু তালিব	
১৫. উপত্যকার বন্দিশালা.....	৯৮
কাফেরদের প্রলোভন.....	৯৮
দ্বিখণ্ডিত চাঁদ.....	১০২
বয়কট	১০৩
১৬. শোকের বছর.....	১০৬
আবু তালিবের মৃত্যু.....	১০৬
খাদীজা রা. এর ইন্তেকাল.....	১০৮
আবু জাহলের অত্যাচার.....	১১১
তায়েফ গমন	
১৭. আশাবাদী রাসূল.....	১১৭
১৮. আলোর ফেরিওয়ালা.....	১২৩
তোফায়েল বিন আমরের ইসলাম গ্রহণ.....	১২৪
মিরাজ	
১৯. উর্ধ্বজগতের মুসাফির.....	১২৮
জিবরীল আ. এর সাথে যাত্রা.....	১৩০
নবীদের সাথে সাক্ষাৎ.....	১৩২
সিদরাতুল মুনতাহা.....	১৩৩
নামাযের বিধান.....	১৩৪
প্রত্যাবর্তন.....	১৩৭
মদীনায় ইসলাম	
২০. আরবের গুলশান.....	১৩৯
হিজরত	
২১. হাতে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা.....	১৪৩
দ্বিতীয় বাইআতে আকাবা.....	১৪৩
২২. দীর্ঘশ্বাসের ফিসফিসানি.....	১৪৯
অসহায় উম্মে সালামা.....	১৪৯
মদীনায় হিজরত.....	১৫১
২৩. গুপ্তঘাতক.....	১৫৫
রাসূল সা. এর হিজরত.....	১৫৬
২৪. মরুপথের পথিক.....	১৬১
উম্মে মাবাদের ঘটনা.....	১৬২

সুরাকা বিন মালিকের ঘটনা.....	১৬৪
মদীনায় মহানবী সা.	
২৫. নবীর শহর.....	১৬৬
কুবায় নবীজি.....	১৬৮
আবু আইয়ুব আনসারীর ঘরে.....	১৭০
বাদশাহ তুকার চিঠি	১৭১
২৬. কুচক্রী ইহুদি	১৭৪
আবদুল্লাহ ইবনে সালামের ইসলাম গ্রহণ...১৭৫	
২৭. মুনাফিক-সর্দার.....	১৮০
মুহাজির-আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন....১৮১	
মদীনা সনদ.....	১৮২
ইহুদিদের সাথে চুক্তি.....	১৮৭
বদর যুদ্ধ	
২৮. নতুন রূপে পুরনো পৃথিবী.....	১৮৯
আয়েশা রা. এর রুখসতি.....	১৯০
কিবলা পরিবর্তন.....	১৯৮
২৯. আসন্ন যুদ্ধের পদধ্বনি.....	১৯৯
আবু সুফিয়ানের কাফেলা.....	২০০
মুশরিকদের যুদ্ধপ্রস্তুতি.....	২০২
৩০. বদরের রণাঙ্গন.....	২১০
মুখোমুখি দুই বাহিনী.....	২১৩
আসমানি সাহায্য.....	২১৫
৩১. জয়ের কেতন ওড়ে.....	২১৮
আবু জাহলকে হত্যা.....	২১৯
৩২. প্রতিফল ও পুরস্কার.....	২৩১
আবু লাহাবের ধ্বংস.....	২৩২
রাসূল সা.কে হত্যার ষড়যন্ত্র	
৩৩. ইহুদি সন্ত্রাস.....	২৩৮
উমাইরের দুঃসাহস.....	২৩৮
আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মুনাফিকি.....	২৩৯
কাব বিন আশরাফের ষড়যন্ত্র.....	২৪৪
উহুদ যুদ্ধ	
৩৪. যুদ্ধ জয়ের পর.....	২৪৫
উহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতি.....	২৪৬
মুখোমুখি দুপক্ষ.....	২৫২
হামযা রা. এর শাহাদাত.....	২৫৪
৩৫. রক্তের রঙে জান্নাতের খুশবু.....	২৫৭
সাহাবায়ে কেরামের আত্মত্যাগ.....	২৫৭

রাসূল সা. এর শাহাদাতের গুজব.....২৬২

৩৬. বেদনার পাণ্ডুলিপি.....২৭৭

মদীনার পথে উম্মে সালামা রা. ২৭৭

আবু সালামা রা. এর শাহাদাত.....২৮০

আযল ও কারাহের বিশ্বাসঘাতকতা.....২৮০

বীরে মাউনার ঘটনা.....২৮২

বনু নাযীরের গাদ্দারি.....২৮৪

উম্মে সালামা রা. এর বিবাহ ২৮৮

খন্দক যুদ্ধ

৩৭. পরিখার যুদ্ধ.....২৯২

সালমান ফারসী রা. এর ঘটনা.....২৯২

পরিখা খনন ও রাসূল সা. এর মুজিয়া.....২৯৩

সাফিয়া রা. এর দুঃসাহসিকতা.....২৯৮

৩৮. প্রতারকদের মৃত্যু-পরোয়ানা.....৩০৪

বনু কুরাইযার দুর্গ অবরোধ.....৩০৬

সাদ বিন মুআয রা. এর ফয়সালা.....৩০৮

সাদ বিন মুআয রা. এর ইন্তেকাল.....৩১০

যায়নাব বিনতে জাহাশ রা. এর সাথে বিবাহ

৩৯. অপমানের অপচেষ্টা.....৩১১

যায়নাব রা. এর বিবাহ ও বিচ্ছেদ.....৩১১

আসমানি বিবাহ.....৩১২

আবু রাফের মৃত্যু.....৩১৪

আবুল আসের ইসলাম গ্রহণ.....৩১৭

ইফকের ঘটনা

৪০. আহ, অপবাদ!.....৩১৯

জুওয়াইরিয়া রা. এর সাথে বিবাহ.....৩২১

আয়শা রা. এর উপর অপবাদ.....৩২৪

নির্দোষ ঘোষণায় অহী নাযিল.....৩২৮

হুদাইবিয়ার সন্ধি

৪১. প্রকাশ্য বিজয়.....৩৩০

উমরার উদ্দেশ্যে মক্কার পথে.....৩৩০

বাইআতে রিদওয়ান.....৩৩৩

সন্ধি.....৩৩৭

৪২. আলোর মিছিল.....৩৪২

পৃথিবীব্যাপী ইসলামের দাওয়াত.....৩৪৫

পারস্যসম্রাটের প্রতি পত্র প্রেরণ.....৩৪৬

রোমসম্রাটের প্রতি পত্র প্রেরণ.....৩৪৮

খায়বার যুদ্ধ	
৪৩. দুর্গের শহর.....	৩৫৪
খায়বার যুদ্ধের প্রস্তুতি.....	৩৫৫
খায়বার বিজয়.....	৩৫৯
৪৪. ভালোবাসার নগরী.....	৩৬৮
সাফিয়া রা. এর সাথে বিবাহ.....	৩৭০
যাতুর রিকা অভিযান.....	৩৭২
উমরাতুল কাযা.....	৩৭৫
মুতা যুদ্ধ	
৪৫. আল্লাহর তরবারি.....	৩৭৮
খালিদ সাইফুল্লাহর ইসলাম গ্রহণ.....	৩৭৯
মুতার রণাঙ্গনে.....	৩৮২
মক্কা বিজয়	
৪৬. মক্কার পথে.....	৩৮৯
হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ.....	৩৯০
মক্কার উদ্দেশে যাত্রা.....	৩৯৫
আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ.....	৩৯৬
৪৭. মক্কা বিজয়.....	৪০১
অপরাধীদের শাস্তি.....	৪০৫
হিন্দার ইসলাম গ্রহণ.....	৪০৭
হুনাইন যুদ্ধ	
৪৮. হুনাইন প্রান্তরে.....	৪১২
তায়েফ দুর্গ অবরোধ.....	৪১৬
তাবুক যুদ্ধ	
৪৯. শেষ যুদ্ধ.....	৪২৪
তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি.....	৪২৬
যুদ্ধজয়.....	৪৩০
বিদায় হজ	
৫১. বিদায় হজ.....	৪৪১
বিদায় হজের ভাষণ.....	৪৪২
ইন্তেকাল	
৫২. মহাজগতের পথে.....	৪৪৭
রাসূল সা. এর অসুস্থতা.....	৪৪৮
ফাতেমা রা. এর সাথে কথোপকথন.....	৪৫৩
ইন্তেকাল.....	৪৫৮

ইতিহাসের ইতিহাস

আরব উপদ্বীপ । পনেরোশো বছর আগের একটি উত্তম দিন । গনগনে সূর্যের রাজত্ব আকাশজুড়ে । কোথাও বৃষ্টিবর্ষণকারী এক টুকরো মেঘ নেই । চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে সূর্যরশ্মি ছিটকে পড়ছে চারদিকে । নিচে বালিয়াড়িতে ছোট্ট একটি কাফেলা । গুরু গরম লু-হাওয়ার সাথে উড়ে আসা তীক্ষ্ণ বালুকণা ধাক্কা খাচ্ছে কাফেলার সদস্যদের গায়ে । কাফেলার সবচেয়ে সৌম্যদর্শন মানুষটি মনে মনে খুবই বিরক্ত । বিরক্ত হওয়ারই কথা । তাঁর জায়গায় অন্য কেউ হলে কঠোর ব্যবহার করতো । কিন্তু আবদুল মুত্তালিবের ব্যক্তিত্ব অসাধারণ । ‘মেহেরবানি’ তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । তিনি অন্যদের চেয়ে একদমই আলাদা । তাঁর সুন্দর স্বপ্নটিও তাই প্রমাণ করে । এ কথাটাই যদি সফরসঙ্গীরা বুঝতো, তাহলে সবাইকে এভাবে রোদে পুড়ে মরতে হতো না ।

ঘটনার সূত্রপাত কিছুদিন আগে। আবদুল মুত্তালিব সেদিন হাতীমে ঘুমিয়ে ছিলেন। স্বপ্নে দেখলেন, এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বলছে, ‘বাররা খনন করো’। আবদুল মুত্তালিব শব্দটির অর্থ বুঝতে পারলেন না। জানতে চাইলেন, ‘বাররা কী?’ স্বপ্নমানব জবাব না দিয়ে চলে গেলো।

পরদিন আবদুল মুত্তালিব তাকে আবারও স্বপ্নে দেখলেন। এবার সে বললো, ‘মাযনুনা খনন করো’। আবদুল মুত্তালিব বললেন, ‘মাযনুনা কী?’ সে আগের মতোই উত্তর না দিয়ে চলে গেলো।

আবদুল মুত্তালিব তৃতীয় দিন আবারও তাকে স্বপ্নে দেখলেন। এবার সে বললো, 'তাইবা খনন করো'। আবদুল মুত্তালিব জানতে চাইলেন, 'তাইবা কী?' এবারও কোনো জবাব পাওয়া গেলো না।

অদ্ভুত! কারো কাছ থেকে নির্দেশ আসছে, কিন্তু নির্দেশটা কী, তা স্পষ্ট নয়।

চতুর্থবার যখন আবদুল মুত্তালিবকে বলা হলো, ‘যমযম খনন করো’ আর তিনি জানতে চাইলেন, ‘যমযম কী?’ তখন উত্তর এলো, ‘যমযম পবিত্র পানির একটি

কূপ, যে কূপের পানি কখনো নিঃশেষ হবে না! অসংখ্য হাজী এ কূপের পানি দ্বারা পিপাসা নিবারণ করতে পারবে।’

এরপর কূপটা কোথায়, সে সম্পর্কে কিছু বর্ণনা আবদুল মুত্তালিবকে দেওয়া হলো। ঘুম থেকে জেগে আবদুল মুত্তালিব ভাবলেন, পরপর কয়েকদিন একইরকম স্বপ্ন দেখেছেন, নিশ্চয় এটি সত্য স্বপ্ন। তিনি কুরাইশদের ডেকে স্বপ্নের কথা খুলে বলে কূপটা খনন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু কুরাইশরা তাঁর কথায় বিরক্ত হলো। পুরো ব্যাপারটাকে তারা নিছক স্বপ্ন মনে করে তাঁকে সঙ্গ দিতে রাজি হলো না।

আবদুল মুভালিব একা একাই স্বপ্নে দেখা কূপের নির্দিষ্ট স্থান খুঁজে বের করে পুত্র হারিসকে নিয়ে মাটি খনন করতে শুরু করলেন। সন্ধ্যার গলে যাওয়া লালচে-সোনালি আলোয় মিশে গেলো পিতা-পুত্রের লাগাতার পরিশ্রম এবং দুই-তিন দিন পর বেরিয়ে এলো হাজার বছর আগের পুরনো কূপ, যা শত শত বছর ধরে মাটির নিচে চাপা পড়ে ছিলো। কূপের ভেতর থেকে পাওয়া গেলো অনেকগুলো তরবারি, লৌহবর্ম আর স্বর্ণহরিণ।

কুরাইশরা কূপ খননকালে আবদুল মুত্তালিবকে সঙ্গ দেয়নি, কিন্তু কূপ আবিষ্কার হওয়ার পর কূপের অংশীদারত্ব নিয়ে বিবাদ শুরু করে দিলো। আবদুল মুত্তালিবও দাবি ছাড়তে রাজি নন। স্বপ্নটা যে তিনি একাই দেখেছেন। এ কাজের জন্য কেবল তাঁকেই মনোনীত করা হয়েছে। তাছাড়া যমযম কূপ তো সাধারণ কোনো কূপ নয়; ঐতিহ্যবাহী এক কূপ। এ কূপের কারণেই মক্কার শূকনো বালুভূমিতে প্রাণের সঞ্চগর হয়েছিলো। এ কূপের সাথে জড়িয়ে আছে আরব-ইতিহাসের বিখ্যাত শিশুর তৃষ্ণা নিবারণের গল্প।

বহু বছর আগের সেই ঘটনা। তখন পাথর ও বালুর পাহাড়বেষ্টিত মরুভূমি ছিলো নীরব ও জনমানবহীন। কোথাও ফল-ফুলের গাছ ছিলো না, দূরদূরান্ত পর্যন্ত সবুজের কোনো চিহ্ন ছিলো না। ছিলো না কোনো নদী, পুকুর, ঝরনা বা কূপ। পানির পিপাসায় কাতরাতো শুকনো মাটির বুক। কখনো বৃষ্টি হলে জলের শেষ বিন্দুটুকুও শেষে নিতো অতৃপ্ত বালুভূমি। এ কারণে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানো কোনো যাবাবরদল খাঁখাঁ এই জগতে জীবনযাপনের চিন্তাও করতো না।

আল্লাহর ঘর কাবা তখন ছিলো সামান্য উঁচু এক টুকরো জমি। সেখানে দলে দলে তাওয়াফ করতে আসতো না কেউ। সে সময় মানবজাতি জানতোই না, মক্কাভূমিতে লুকানো আছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঘর কাবা।

একদিনের কথা। সূর্যের নিষ্ঠুর তাপে পুড়ে, সমতল-অসমতল বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে, কোথাও বালিয়াড়ি, কোথাও পাথুরে পাহাড় ডিঙিয়ে ফিলিস্তিন থেকে কাবাঘরের অদূরে এসে অবস্থান নেয় তিনজন মানুষের ছোট্ট এক কাফেলা। প্রথমজন মহান নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, দ্বিতীয়জন তাঁর স্ত্রী হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আনহা আর তৃতীয়জন তাদের ছোট্ট শিশুপুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালাম।

যেখানে কেউ আসে না, সেখানে মানুষের আগমন অদ্ভুত লাগে; কিন্তু আরো অদ্ভুত লাগলো, যখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম স্ত্রী-পুত্রকে এই নির্জন স্থানে একা রেখে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। অজানা-অচেনা দেশ, জনমানবহীন প্রান্তর, কোথাও কেউ নেই, খাওয়াদাওয়ার কোনো ব্যবস্থাও নেই। শুধু মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত উঠে গেছে অদ্ভুত এক শূন্যতা। বুক-হু হু-করা সেই শূন্যতায় প্রিয়জনকে রেখে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি দেখে তাঁর স্ত্রী হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন বেদনাহত। প্রিয়তমের এমন আচরণের রহস্য বুঝতে পারছিলেন না তিনি। তাই স্বামীর সাথে চলতে চলতে ব্যাকুলভাবে বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন, ‘আপনি কেন এমন আচরণ করছেন? কী এমন হয়েছে!’ কিন্তু বুকে বেদনার পাষাণবাঁধা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কিছুই বলছিলেন না। একসময় হাজেরা জানতে চান, ‘আপনি কি আল্লাহর হুকুমে আমাদেরকে এভাবে ফেলে যাচ্ছেন?’ তিনি ইঙ্গিতে উত্তর দেন, ‘হ্যাঁ।’ উত্তর শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শান্ত হন হাজেরা। দৃঢ় মনোবল নিয়ে বলে ওঠেন, ‘তাহলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না।’

সামান্য খেজুর আর পানি স্ত্রী-পুত্রের কাছে রেখে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ফিরতি পথ ধরে চলতে থাকেন। বারবার ফিরে তাকাচ্ছিলেন জীবনসঙ্গিনী ও একমাত্র সন্তানের দিকে। যেখানে গিয়ে স্ত্রী-পুত্র চোখের আড়াল হয়ে গেলো, সেখানে দাঁড়িয়ে কাবার শূন্য ভূমির দিকে মুখ করে মহান রবের দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করলেন। বললেন, ‘হে আমার প্রতিপালক, আমি আমার পরিবারের কিছু সদস্যকে আপনার মর্যাদাপূর্ণ ঘরের সন্নিহিতে চাষাবাদবিহীন উপত্যকায় বসবাসের জন্য রেখে যাচ্ছি; রব, যাতে তারা নামায কয়েম করে। অতএব কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন এবং তাদেরকে ফলফলাদি দ্বারা রিযিক দান করুন। হয়তো তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।’

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বন্ধুর দুআ এমনভাবে কবুল করে নিলেন যে, শূন্য বুকে পূর্ণতা পাওয়ার জন্য বিরান সে ভূমিকে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি।

স্বামী ফিলিস্তিনের পথ ধরে চলে যাওয়ার পর হাজেরা পড়লেন প্রাকৃতিক বিপদে। মরুভূমির দেশে প্রাণ টিকিয়ে রাখা এত কঠিন যে, পানি ছাড়া এক মুহূর্তও চলে না। পানিই এখানে সবচেয়ে বড় সম্পদ। পানিই সবচেয়ে বড় রহমত। অচিরেই ফুরিয়ে গেলো হাজেরার মূল্যবান সম্পদের শেষ বিন্দু পর্যন্ত। ফুরিয়ে গেলো খেজুরও। আর তাতে হঠাৎ করেই ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কষ্ট সাক্ষাৎ মৃত্যুর রূপ ধারণ করে সামনে উপস্থিত হলো। হাজেরা ভেবে পাচ্ছিলেন না কী করবেন। সময় যত গড়াচ্ছে, কষ্ট তত বাড়ছে। বাচ্চাটিও তৃষ্ণায় ছটফট করতে শুরু করেছে। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে একফোঁটা পানি?

অসাধারণ দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে একাই শিশুপুত্র নিয়ে জনমানবহীন মরুভূমিতে একা থাকার হিম্মত করেছেন যে রমণী, তিনি শেষ পর্যন্ত আর স্থির থাকতে পারলেন না, অস্থির হয়ে পড়লেন—সন্তান যে তাঁর তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত। এদিকে দৃষ্টির সীমানায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারিসারি পাহাড়। তিনি পাহাড়ে আরোহণের কথা ভাবলেন। শিশুপুত্রকে শুইয়ে রাখলেন জমিনে। তারপর পানির খোঁজে নিকটবর্তী সাফা নামক একটি পাহাড়ে চড়লেন। কিন্তু না, দৃষ্টিসীমায় কিছুই নেই—না পানি, আর না প্রাণ। সাফা থেকে নেমে এলেন হাজেরা। রওনা হলেন মারওয়া পাহাড়ের উদ্দেশে। মাঝে কিছুটা নিম্নভূমি থাকায় সন্তানকে দেখা যাচ্ছিলো না। দৌড়ে পার হলেন তিনি জায়গাটা। তারপর চড়লেন মারওয়া পাহাড়ে। নাহ, এখান থেকেও পানি ও প্রাণের কোনো চিহ্ন দেখা গেলো না। হাজেরা দিশেহারার মতো আবার দৌড়ে গেলেন সাফায়, আবার মারওয়ায়, তারপর আবার সাফায়। এভাবে চলতে থাকলো। প্রতিবারই আশাহত হচ্ছিলেন। প্রতিবারই দেখলেন—কোথাও কেউ নেই। নির্জন-নিস্তব্ধ অসীম শূন্যতা।

সপ্তমবার হাজেরা হঠাৎ একটি শব্দ শুনতে পেলেন। ফিরে তাকিয়ে দেখলেন আল্লাহর প্রেরিত একজন সম্মানিত ফেরেশতাকে। দেখতে পেলেন, শিশু ইসমাঈলের কাছেই ফেরেশতার পায়ের আঘাতে সৃষ্ট হয়েছে আশ্চর্য এক ফোয়ারা। শুকনো ও শক্ত ভূমি থেকে বেরিয়ে আসছে অপার্থিব পানির পার্থিব ধারা। এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে ছুটে গেলেন তিনি শিশুপুত্রের দিকে। কোলে তুলে নিলেন পরম মমতায়। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে সন্তানকে পানি পান করালেন। আল্লাহর ফেরেশতা তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন—‘আপনি ভয় পাবেন না। এখানেই আছে আল্লাহর পবিত্র ঘর। আপনার এই শিশুপুত্র ও তাঁর পিতা পুনরায় আল্লাহর ঘর নির্মাণ করবেন। আল্লাহ তাঁর ঘরের বাসিন্দাদের ধ্বংস করবেন না।’ কথা শেষ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ফেরেশতা।

৩.
পৃথিবী জুড়ে অস্বাকার

স্বচ্ছ কাচের মতো আকাশ। বাতাসের শরীরে ভর করে বালু-পাথরের ছোট ছোট বাড়িগুলোর উপর দিয়ে ওড়াউড়ি করছে আয়েশি ধূলিকণা। হলুদাভ রোদে ঝলমল করতে থাকা প্রাচীন শহরটা মানুষের কলকাকলিতে মুখরিত। কিন্তু হঠাৎ করে যেন রোদে আক্রান্ত শহরটা নিঃশব্দ আতর্নাদ শুরু করে। মক্কার গোত্র-সর্দারদের মুখ অন্ধকার হয়ে যায়। অন্ধকার হয়ে যায় আবদুল মুত্তালিবের মুখও। দারুন নদওয়ায় কত বৈঠকে বসেছেন তিনি, কত সমস্যার সমাধান করেছেন, কিন্তু এই বিপদের সমাধান তাঁর জানা নেই। আল্লাহর ঘর কাবা ধ্বংস করতে বিশাল হস্তিবাহিনী নিয়ে ধেয়ে আসছে ইয়ামানের গভর্নর আবরাহাতুল আশরাম! মক্কায বীর যোদ্ধার অভাব নেই, বরং প্রতিটি ঘরের প্রায় প্রত্যেকেই যোদ্ধা, কিন্তু সবাই মিলেও এত বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করা কঠিন।

আবরাহাতুল আশরাম হিংসুক ও কুটিল প্রকৃতির লোক। তার হৃদয়টা ঘৃণা ও আক্রোশে ভরা। কারো ভালো সে সহ্য করতে পারে না। কাবার সুনাম ও প্রতি বছর অসংখ্য হাজীর কাবা তাওয়াফের জন্য মক্কায় আগমন তার অন্তরে হিংসার আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে নির্বোধ লোকটার অন্তর্দৃষ্টি!

হৃদয়ের উত্তপ্ত ধ্বংসকুণ্ডে প্রশান্তির পানি ঢালার জন্য কিছুদিন আগে সে ইয়ামানের রাজধানী সানআতে কারুকার্যময় মনোরম একটা উপাসনালয় তৈরি করেছিলো। তার আশা ছিলো—মানুষ কাবার পরিবর্তে সেখানে গিয়ে ইবাদত করবে। তার এই হীন উদ্দেশ্যের কথা আরবে ছড়িয়ে পড়ার পর বনু কিনানা গোত্রের এক দুষ্টলোক আবরাহার সুরম্য উপাসনালয়ে প্রাকৃতিক কর্ম সেরে পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় রেগে অস্থির হয়ে যায় আবরাহা। পণ করে—কাবাঘর ধ্বংস না করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে না। তার হৃদয়ের ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়ে দেবে সে মন্কার সূর্য। শুরু হয় রণপ্রস্তুতি! ঢংঢং করে বেজে ওঠে যুদ্ধের ঘণ্টা। ষাট হাজার সৈন্যের বিশাল এক বাহিনী তৈরি করে সে। বিরাট বিরাট অনেকগুলো হাতির ব্যবস্থা করে। তারপর রওনা দেয় মহাশক্তিধর প্রভুর পবিত্র ঘর ধ্বংস করতে।

মন্সার কাছাকাছি পৌঁছার পর সে কিছু সময়ের জন্য যাত্রাবিরতি দিলে তার বিশাল সৈন্যবাহিনী আশপাশ থেকে লুটপাট শুরু করে দেয়। বকরি, উট, ভেড়া,

যেখানে যা পায় তাই নিয়ে চলে যায়।

লুট-হয়ে-যাওয়া উটের মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের উটও ছিলো। আবদুল মুত্তালিব দেরি না করে কুরাইশের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে নিয়ে আবরারার সাথে সাক্ষাৎ করতে যান।

আবদুল মুত্তালিবের মুখমণ্ডলে সর্বদা বিরাজ করে আভিজাত্য ও গান্ধীর্যের ছায়া। তাঁর নজরকাড়া অবয়ব দেখে আবরাহা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। শ্রদ্ধায় সে তার রাজকীয় সিংহাসন ছেড়ে আবদুল মুত্তালিবের পাশে এসে বসে।

আবদুল মুত্তালিব তাঁর উটগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আবরাহা'র কাছে আবেদন জানান। আবরাহা' কাবার দায়িত্বে নিয়োজিত দলপ্রধানের কথা শুনে বিস্মিত হয়। বলে—‘আশ্চর্যের কথা, আপনি আপনার উটের দাবি করছেন, অথচ আপনার বাপ-দাদার উপাসনালয় কাবার ব্যাপারে কোনো দাবি নেই!’ আবদুল মুত্তালিব বললেন—‘আমি উটের মালিক, তাই উটগুলো ফিরিয়ে নিতে এসেছি। কাবার মালিক আল্লাহ, তিনিই কাবাঘর রক্ষা করবেন।’

‘কাবা আল্লাহর ঘর’—সতর্কবাণী শোনার পরও আবরাহা সতর্ক হয় না। সে যখন দেখে আবদুল মুত্তালিব তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, তখন তাঁর উটগুলো ফিরিয়ে দেয়।

আবদুল মুত্তালিব ফিরে এসে উটগুলো কাবার নামে মান্নত করেন। এরপর মক্কার লোকজনকে মক্কা খালি করে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। মানুষ দিশেহারা হয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করে নিজেদের উট-ছাগল নিয়ে ছোটো পাহাড়ের দিকে। আবদুল মুত্তালিব নিজে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে কাবাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কাবাঘর রক্ষা করার জন্য কাতরকণ্ঠে কাবার মালিকের কাছে প্রার্থনা করেন। তারপর সাথীদের নিয়ে তিনিও এক পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নেন।

সময়মতো আবরাহার বাহিনী কাবাঘরের উদ্দেশে পথ ধরে। সাজানো হাতি-ঘোড়া ও বর্শা-বল্লম নিয়ে হুলস্থূল করে একটু একটু করে কাবাঘরের নিকটবর্তী হচ্ছিলো তারা। মুযদালিফা ও মিনার মধ্যখানে উপস্থিত হওয়ার পর তাদের বিরাট বিরাট হাতিগুলো মাটিতে বসে পড়ে। অবোধ পশুর চোখ হিম হয়ে আসে ভয়ে। আল্লাহর ভয়ে হাতিগুলো কাবাঘরের দিকে না গিয়ে অন্যদিকে দৌড়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু হিংসায় অন্ধ বাদশাহ সামনে এগোনোর চেষ্টা করেই যাচ্ছিলো।

এ সময় হঠাৎ করে কোথা থেকে যেন উদয় হলো ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। পুরো আকাশ ছেয়ে গেলো পাখির দলে। ছোট্ট পাখিগুলো ঠোঁটে ও দুই ডানায় করে

আমেনার আলোশিশু

নীরবতার কোলে মাথা রেখে এক এক করে ঘুমিয়ে পড়েছে সকল মানুষ।
লাগামহীন পাখিগুলোও নীরব-নিস্তব্ধ। শুধু জেগে আছে আরব-প্রকৃতি, সেজে
আছে আরব-প্রকৃতি। মাথার উপর ডানা-মেল-থাকা আকাশ অদ্ভুত রূপ ধারণ
করেছে। আকাশের সাথে চাঁদ মেতে উঠেছে গোপন সংলাপে। শত-সহস্র মাইল
দূরের তারাগুলো নিঃসঙ্গতার বিষাদ ভুলে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ঝুঁকে পড়েছে
পৃথিবীর দিকে। মোহনীয় এক সুখের সুর বাতাসে ভর করে উড়ে বেড়াচ্ছে প্রান্তর
থেকে প্রান্তরে। কী যেন একটা ঘটতে যাচ্ছে! কীসের আলামত যেন পৃথিবীর
প্রাণে প্রাণে গান গেয়ে যাচ্ছে।

৫৭০ খ্রিস্টাব্দ। রবিউল আউয়াল মাসের আট তারিখ। আরব-আজমের এই উল্লসিত প্রকৃতি আর বর্ণিল আকাশ বিধবা আমেনার ঘরকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খাচ্ছে। আমেনার বিধ্বস্ত বুকের ভেতরেও এক অপার্থিব আনন্দের কলকলধ্বনি সুখের পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে।

আমেনার কাছে বসে আছেন ফাতেমা বিনতে আবদুল্লাহ নামের এক রমণী। বিপুল বিস্ময় নিয়ে তিনি দেখেন, আকাশের তারাগুলো শ্রদ্ধায় এমনভাবে আমেনার ঘরের প্রতি ঝুঁকে আছে যে, মনে হচ্ছে, তারাগুলো যেন আকাশ ছেড়ে তার উপর এসে পতিত হবে!

শেষ রাতের দিকে সব রহস্যের জট খুলে গেলো। সুবহে সাদিকের সময় আমেনার কোল আলোকিত করে পৃথিবীতে আগমন করলেন আশ্চর্য সুন্দর এক মানবশিশু—তাঁর কচি মুখখানা চাঁদের চেয়েও উজ্জ্বল, তাঁর ছোট্ট দেহখানা সদ্য-ফোটা ফুলের চেয়েও পবিত্র। আমেনার বুক ভরে গেলো অপার্থিব তৃপ্তিতে আর চোখ ভেসে গেলো অজানা এক অলৌকিক আলোয়। সেই আলোয় আলোকিত হয়ে তাঁর চোখের সামনে হঠাৎ ভেসে উঠলো সিরিয়ার রাজমহল!১

প্রকৃতির এমন অপরূপ সাজ দেখে বনু কুরাইয়া, বনু নাযীর, ফাদাক ও খায়বারের ইহুদি পণ্ডিতরা বিস্মিত হয়ে বলাবলি করতে লাগলো—‘আজ রাতে আহমাদের নক্ষত্র উদিত হয়ে গেছে! আহমাদ জন্মগ্রহণ করেছেন!’ তারা তাওরাত থেকে জানতো, আরবের বুকে জন্ম নেবেন সে মানবসন্তান, যিনি হবেন সকল মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সকল নবীর চেয়ে সম্মানিত।২

এক ইহুদি ব্যক্তি শিশু আহমাদের খোঁজে কুরাইশদের এক মজলিসে এসে

জানতে চাইলো—‘আজ রাতে কি তোমাদের কারো পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে?’
লোকজন উত্তরে বললো—‘আমরা এ ব্যাপারে কিছু জানি না!’

ইহুদি তখন অনুরোধ করলো খবর নেওয়ার জন্য। সে বললো—‘আজ রাতে এই উন্মত্তের নবীর জন্মগ্রহণ করার কথা। তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে নবুওয়তের সিল মারা থাকবে!’

কুরাইশরা এমন আশ্চর্যজনক কথা শুনে বৈঠক ভেঙে দিয়ে ইহুদির কথামতো খোঁজ নেওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়লো। অবশেষে জানতে পারলো, সুবহে সাদিকের সময় আবদুল মুত্তালিবের মৃত পুত্র আবদুল্লাহর ঘরে এক পুত্রসন্তান জন্ম নিয়েছে।

তারা ইহুদিকে কথাটা জানালে সে বললো—‘আমাকে নবজাতকের কাছে নিয়ে চলো!’ ইহুদিকে পবিত্র শিশুর কাছে নিয়ে আসা হলে সে দেখলো, ছোট্ট শিশুর দুই কাঁধের মধ্যভাগে সত্যি সত্যি মোহর মারা! সাথে সাথে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর তার জ্ঞান ফিরে এলে সে বললো—‘বনী ইসরাঈলের নবুওয়তের পরম্পরা আজ স্থানান্তরিত হলো। হে কুরাইশ, এই ছোট্ট শিশুটিই একদিন তোমাদের উপর এমন বিজয় লাভ করবে, যার সংবাদ পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত লোকজন জানবে।’^৩

ইহুদির এই ভবিষ্যদ্বাণী তার সাথে থাকা মক্কার লোকজন হয়তো তেমন আমলে নিলো না অথবা তারা আসল ব্যাপার বুঝতেই পারলো না। তাদের মনে দোলা দিচ্ছিলো আনন্দ। কারণ পুত্রশোকে কাতর তাদের সর্দার আবদুল মুত্তালিবের মুখে বহু দিন পর ফুটে উঠেছিলো নির্মল হাসি।

আবদুল মুত্তালিব নাতির জন্মের সুসংবাদ শুনে অতি আনন্দে নাতিকে কোলে নিয়ে প্রথমে কাবায় প্রবেশ করেন। তাঁর কোল আলো করে তুলেছিলেন চাঁদশিশুটি, আবদুল মুত্তালিব কৃতজ্ঞস্বরে আল্লাহকে ডাকেন এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করেন।^{১৪}

শুধু আবদুল মুত্তালিবের মনে নয়, পবিত্র শিশুর জন্ম সকল মানুষের মনেই বর্ষাতে লাগলো আনন্দবৃষ্টি। পবিত্র শিশুর এক জালেম চাচার নাম আবু লাহাব। তার সুওয়াইবা নামক দাসী তার কাছে ছুটে গিয়ে বললেন—‘মালিক, আপনার একটি ভাতিজা জন্মগ্রহণ করেছে!’

জালেম আবু লাহাবও এই সংবাদে এত উৎফুল্ল হলো যে, হাত তুলে ইশারা করে সুওয়াইবাকে বললো—‘সুওয়াইবা, তুমি আমাকে মহা আনন্দের একটি সংবাদ গুনিয়েছো। যাও, তোমাকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে দিলাম!’

৮.
পবিত্র কিতাব

শহরের কোলাহল থেকে দূরে পাহাড়ের চূড়ায় ছোট্ট একটি গুহা। ভেতরে একা বসে আছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। নির্জনতাপ্রিয় হয়ে উঠেছেন তিনি। গত তিন বছর ধরে প্রায়ই ছুটে আসেন পাহাড়ের কোলে, প্রকৃতির আরো কাছে।

গুহাটির খোঁজ তিনি হয়তো পেয়েছেন পেছনে-ফেলে-আসা সুদূর শৈশবের কোনো এক দিনে। তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবও একসময় এই গুহায় এসে ধ্যান করতেন!১ দাদার মতো এখন মুহাম্মাদ এ গুহার ভেতরে ধ্যানমগ্ন হন। নির্জন গুহার ভেতর দীনে হানীফের রেখে যাওয়া পদ্ধতিতে মহান আল্লাহর ইবাদত করেন।

সময় পেরিয়ে যায় ধীরে ধীরে। খাবার ফুরিয়ে যায় সময়ের সাথে সাথে। তখন প্রিয়তমা খাদীজা পাহাড় বেয়ে পৌঁছে দিয়ে যান খাবার। কখনো কখনো খাবার আনতে মহাম্মাদ নিজেই ফিরে যান ঘরে।

ঘর তো তাঁর ঘর নয়, যেন এক টুকরো জান্নাত! সুখের অভাব নেই, অভাব নেই কোলাহলের। পনেরো বছর আগে মহীয়সী খাদীজাকে নিয়ে যে জীবন তিনি শুরু করেছিলেন, সে জীবনে যুক্ত হয়েছে আরো অনেকগুলো জীবন। সুখপাখিদের কলকাকলিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে ‘গুলিস্তানে মুহাম্মাদ’।

তাদের কোল আলো করে প্রথমে জন্ম নিয়েছিলেন কাসেম, কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন জান্নাতি দুনিয়ায়। তারপর একে একে তাঁদের কোল আলো করেছেন যায়নাব, রুকাইয়া, কুলসুম ও ফাতেমা নামে চারজন ‘চাঁদকন্যা’। চাঁদকন্যারা তাদের মায়াকাড়া চোখগুলো মেলে ঘর জুড়ে হাঁটাহাঁটি করেন আর সবার আদর কুড়ান! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খাদীজার স্নেহছায়ায় বাস করেন খাদীজার পূর্ব বিবাহের সন্তানরাও। বাস করেন আব তালিবের বালকপুত্র আলীও।

আলী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের সদস্য হওয়ার কারণ হলো তাঁর পিতার দরিদ্রতা। আবু তালিবের বড় পরিবারে সব সময় অভাব-অনটন লেগে থাকে। যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কেউ ছিলো না, কিছু ছিলো না, তখন আবু তালিব নিজের অভাব-অনটন থাকার পরও তাঁকে লালনপালন করেছেন। তাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

চাচার জন্য কিছু করার সুযোগ পেয়ে সুযোগটা হাতছাড়া করেননি। তিনি তাঁর আরেক চাচা আব্বাসের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলেন। আব্বাস বনু হাশিমের বিশিষ্ট ধনী। দুজনে ঠিক করেন, তাঁরা আবু তালিবের দুটি সন্তানকে দেখাশোনার ভার নেবেন। এতে আবু তালিবের উপর পরিবার পরিচালনার ভার কিছুটা হলেও লাঘব হবে। কথামতো আব্বাস নিয়ে গিয়েছিলেন জাফর ইবনে আবু তালিবকে আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ে এসেছিলেন আলী ইবনে আবু তালিবকে। ২

মুহাম্মাদ ও খাদীজার সাথে আরো বাস করেন উম্মে আইমান ও যায়দ ইবনে হারিসা। উম্মে আইমান মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত পিতা আবদুল্লাহর ক্রীতদাসী ছিলেন। আর যায়দ ইবনে হারিসা খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা দাস ছিলেন। খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপহার হিসেবে পেশ করেন। যায়দ শৈশবে দাস ছিলেন না। দুর্ঘটনাবশত যুদ্ধবন্দি হয়ে দাসের বাজারে বিক্রি হয়ে গিয়েছিলেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আসার পর একদিন তাঁর পিতা ও চাচা তাঁকে দাসত্বের জীবন থেকে মুক্ত করে ফিরিয়ে নিতে এলে তিনি নবীজিকে ছেড়ে যেতে রাজি হননি। পরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে আজাদ করে আরবের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করে নেন।

যায়দ, আলী এবং অন্য সকল সদস্য নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংসার সুখে পরিপূর্ণ। সবার মুখে লেগে থাকে মিষ্টি হাসি; তারপরও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মন শান্ত নয়। তাঁর মন থাকে অস্থির। অন্ধকার গহ্বরে পতিত সমাজের দুর্দশা তাঁকে কষ্ট দেয়। শিরক, কুসংস্কার, জাহেলি রীতিনীতি আরবসমাজকে এমনভাবে নষ্ট করে দিয়েছে যে, ধ্বংসের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে মানবতা মৃত্যুর প্রহর গুনছে!

‘হিলফুল ফুযুল’ সমাজের যুদ্ধ-বিগ্রহে কিছুটা শীতল পানি ঢেলে দিলেও যুদ্ধের ভয় এখানে লেগেই থাকে। মাত্র পাঁচ বছর আগেই আরবরা কাবাঘর নিয়ে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাধাতে যাচ্ছিলো। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কল্যাণে সেদিন তারা প্রাণে বেঁচে গেছে। সে বছর প্লাবনের কারণে কাবার দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছিলো, তাই কাবা সংস্কারের লক্ষ্যে কুরাইশরা কাবা পুনঃনির্মাণে হাত দেয়। এ কাজে হালাল অর্থ দিয়ে এবং পৃথক পৃথকভাবে পাথর সংগ্রহ করে

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মনটা অস্থির। হিংসা ও বিদ্বেষ তার মনকে দিবাশি যন্ত্রণার চাবুক দিয়ে আঘাত করেই চলেছে। কিছু বলাও যাচ্ছে না, সওয়াও যাচ্ছে না—কী এক অদ্ভুত জ্বালায় মনটা পুড়ছে!

মদীনার বাদশাহির অদৃশ্য মুকুট আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের চোখের সামনে
 দ্যুতি ছড়িয়ে দুলছিলো, ঠিক সে সময়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের
 আগমনে কোথা থেকে যেন এক অদৃশ্য বাতাস এসে এক ঝটকায় কল্লনার রঙিন
 মুকুট কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেলো।

বুআসের যুদ্ধের পর আউস ও খায়রাজ গোত্র আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে নিজেদের নেতা করার ব্যাপারে একমত হয়েছিলো, কিন্তু তারপর কী যে হয় মানুষগুলোর! নবী মুহাম্মাদের পায়ের কাছে তাঁদের জীবন এমনভাবে সঁপে দেয়, যেন তাঁরা কাদামাটির দলা আর মুহাম্মাদ তাঁদেরকে নিজের ইচ্ছামতো গড়তে পারেন!

মানুষটির সেই ক্ষমতা সত্যি আছে বটে! তাঁর সুন্দর মুখে সর্বদা সত্যের একটি আলো কোমল চাঁদের মতো ঝলমল করে। চারপাশে তাঁর সহস্র সমস্যার পরও মুখে সর্বদা মন-ভালো-করে-দেওয়া মিষ্টি এক টুকরো হাসি লেগেই আছে। তাঁর সম্ভ্রান্ত কথাবার্তার সাথে তাঁর অমায়িক আচরণ যে কারো মনকে মুগ্ধ করে দেয় মুহূর্তেই! কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মনে এ সব প্রভাব ফেলতে পারেনি। তার মনে যে লোভের আগুন জ্বলছে! মনের ভেতরের হিংসার কালো আগুনে পুড়ে গেছে তার অন্তর্দৃষ্টি। তার চোখে মানুষটার সৌন্দর্য দেখা যায় না, বরং প্রচণ্ড এক বিদ্বেষ প্রতিশোধস্পৃহা জাগিয়ে তোলে একটু একটু করে।

কিন্তু যিনি সকলের প্রিয়, তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করার সুযোগ নেই। মানুষটি সবাইকে মুক্ত করে রেখেছেন, পাশাপাশি একের পর এক সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক সঙ্কটে জর্জরিত মদীনাকে ফুলের বাগানে পরিণত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ইবাদতে জড়ো করার জন্য খ্রিস্টানরা ঘণ্টা বাজায়, ইহুদিরা শিঙ্গা বাজায়, অগ্নিপূজকরা আগুন জ্বালায়, কিন্তু মুসলমানরা আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করে মানুষকে আহ্বান করে। ইবাদতের সময় মদীনার আকাশে-বাতাসে বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর জাদুময়ী কণ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে আযানের মনমাতানো সুমধুর সুর!



পান করেছেন তিনিও ।৬

আরেক উমাইর তো খেজুর খেতে শুরু করে সেটা ফেলে দিয়েছেন জীবন দীর্ঘ হবে বলে। অতঃপর কাক্ষিত শাহাদাত বরণ করে চির আনন্দের জান্নাতি জীবন লাভ করেছেন। ওপারের জগতে তাঁদের জন্য সাজিয়ে রাখা আছে আশ্চর্য সুন্দর জান্নাত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদদের পরিবারকে এ সুসংবাদ দেন। মদীনায ফেরার পর বদর যুদ্ধে শহীদ হারিসা বিন সুরাকা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মা রাসূলুল্লাহর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন—‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, নিশ্চয় জানেন, আমি হারিসাকে অত্যন্ত স্নেহ করতাম। সুতরাং সে যদি জান্নাতি হয়, আমি ধৈর্যধারণ করবো এবং আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশা করবো। অন্যথায় আপনি দেখতে পাবেন আমি কী করি!’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—‘পাগল হয়েছে! একটা জান্নাত নয়, তার জন্য রয়েছে অনেকগুলো জান্নাত। নিশ্চয় সে জান্নাতুল ফিরদাউসে অবস্থান করছে।’৭

বদর যুদ্ধের চৌদ্দজন শহীদকে আল্লাহ তাআলা স্বীয় সাক্ষাৎ দানে তাঁদের দৃষ্টি উজ্জ্বল করবেন। আর তাঁদের উদ্দেশ্যে বলবেন—‘হে আমার বান্দারা, তোমরা কী চাও?’ তাঁরা বলবেন—‘হে রব, অসংখ্য নেয়ামতে ভরপুর যে জান্নাত আপনি আমাদের দিয়েছেন, এর চেয়ে মহান সওগাত আর কী হতে পারে!’ আল্লাহ আবার বলবেন—‘তোমরা কী চাও?’ তাঁরা বারবার একইরকম উত্তর দেবেন। চতুর্থবার এই প্রশ্নের উত্তরে শহীদগণ আরয় করবেন—‘আমরা চাই আমাদের শরীরে আত্মা ফিরিয়ে দিন, আমরা আবার আপনার পথে লড়াই করে শহীদ হতে আগ্রহী!’^৮

শহীদদের এ বিরল সম্মান এবং কাফেরদের এ কঠিন পরিণতির মাঝে কী বিপুল ব্যবধান! তারপরও কিছু মানুষ কখনোই বোঝে না। তারা নিজ চোখে সত্যের বিস্ময়কর জয় দেখার পরও বিরত হয় না তাদের শয়তানি কর্মকাণ্ড থেকে। শয়তান মানুষকে ধ্বংস করার চেষ্টায় রত আছে সর্বদা আর পৃথিবীর সবখানে কোনো না কোনো অবাধ্য আত্মা তাকে অনুসরণ করে যায়।

তবে সব জায়গায় আছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলপ্রেমী এমন মানুষ, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পিছপা হন না। যেমন : উমাইর ছিলেন একজন অন্ধ সাহাবী আর আসমা ছিলো এমন এক নিকৃষ্ট ইহুদি মহিলা, যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে অশ্লীল কবিতা রচনা করে তা আবৃত্তি করতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বদর যুদ্ধে

ইসলামি সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে পরিণত হয় এক অজেয় দুর্গে। কাফের ও মুনাফিকরা যখন দেখে এই দলটিকে যুদ্ধের মাধ্যমে পরাজিত করা সম্ভব নয়, অস্ত্র ও লোকবল এদের শক্তি নয়, বরং এদের শক্তি আত্মায়, আর সেই শক্তির মূল উৎস আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তখন তারা তাঁকে মানসিক আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে দিতে চায়।

মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে এমন কুকর্মে। যায়নাব বিনতে জাহাশের বিয়েতে যে সব কুকথা ওরা বলেছিলো, তা যখন স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীন খণ্ডন করেন, তখন সে আরেকটি সুযোগের অপেক্ষায় থাকে! আর হঠাৎ করে একটি দুর্ঘটনার কারণে তার সামনে সেই সুযোগটি এসে যায়...।

আহ, অপবাদ!

নির্জন মরুভূমির বুক চিরে চলতে থাকা সফররত একটি কাফেলা বিশ্রামের জন্য যাত্রাবিরতি দেয়। অল্প বয়সের হালকা-পাতলা একজন কিশোরী প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হাওদা থেকে নেমে একটু দূরে আড়ালে চলে যান। তাঁর গলায় শোভা পাচ্ছে বড় বোনের কাছ থেকে ধার-করে-আনা সুন্দর একটি হার। প্রয়োজন সেরে ফিরে আসার সময় হঠাৎ তিনি খেয়াল করেন, তাঁর গলা থেকে হারটি কোথাও খুলে পড়ে গেছে। কাফেলার কাউকে না ডেকে এদিক-সেদিক খুঁজতে শুরু করেন তিনি। একসময় পেয়ে যান হারটি এবং দ্রুত কাফেলার কাছে ফিরে এসে চমকে ওঠেন—নির্জন মরু বিয়াবানে তিনি একা দাঁড়িয়ে আছেন!

তাঁর কাফেলা তাঁকে ফেলে চলে গেছে বহুদূর। কোথাও তাঁদের ছায়াও দেখা যাচ্ছে না। হালকা-পাতলা বলে হাওদা বহনকারীরা বুঝতে পারেনি ভেতরে কিশোরীটি নেই!

কিশোরী প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। পথ হারিয়ে ফেলার ভয়ে নির্জন মরুতে একা একা চলতে শুরু না করে তিনি চমৎকার একটি সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ঠিক করেন, যেখানে আছেন সেখানেই থাকবেন। কাফেলা থেমে গেলে যখন তাঁর অনুপস্থিতি জানা যাবে, তখন নিশ্চয়ই তাঁর খোঁজে লোক পাঠানো হবে। কিশোরী

৪. মুসতাদরা কে হাকিম, ২/৬০৩।